তারিখ : 12 DEC 2017 ... ৪ ... কলাম ... ৩

কালের কণ্ঠ

জয়া ফারহানা

‘ছিলাম খাঁচায় এখন বসিয়াছি দাঁড়ে, পায়ের শিকল...’

মানব ইতিহাসে যে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে জ্ঞান বিতরণের নিয়ম চালু হয়েছিল, সেই ভারতবর্ষ যা আজকের বাংলাদেশ, সেখানে কিভাবে শিক্ষকরা জবরদস্তি খাটিয়ে কোচিংয়ের নামে ছাত্রদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন এবং তাঁদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে কিভাবে ক্লাস টিউশনে ফেল করিয়ে দিচ্ছেন। যে মেধাবী শিক্ষার্থীকে কোনোক্রমেই ফেল করানো সম্ভব নয়, তাকে কায়দা করে কম নম্বর দিচ্ছেন এবং নিজেদের এসব দুর্নীতি জায়েজ করার জন্য গভর্নিং বডির কাউকে কাউকে পকেটে পুরে ফেলছেন

শিক্ষা মেপে দেখার জিনিস নয়। অতলের জিনিস বলে প্রাণ দিয়ে দেখতে হয় শিক্ষাকে। আর এখানেই যত গোলমাল। প্রাণ দিয়ে দেখবে কী, পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে দিতে আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। এরপর আছে সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা–তিন বেলা কোচিং, প্রাইভেট টিউশন, হোমওয়ার্ক। প্রাণের আর অবশিষ্ট থাকে কী যে অতলের গভীরতা অনুভব করবে? কোচিং করতে করতে গাইড বই পড়তে পড়তে এবং পরীক্ষা দিতে দিতে তারা লিলিপুটে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তোতাকাহিনির তোতার মতো। মূর্খ তোতাকে শিক্ষিত করতে সকালে ভূগোল, বিকেলে ইংরেজি, সন্ধ্যায় ইতিহাস...কিলিয়ে, গিলিয়ে মূর্খ তোতা শেষ পর্যন্ত শিক্ষিত হয়েছিল বটে, তবে সে জীবিত তোতা নয়, মৃত। পেটের মধ্যে গজগজ খসখস করছিল অসার কিছু নথিপত্র। তাতে কী, তোতা মরল বটে, তবে শিক্ষিত তো হলো। আমাদের পরীক্ষানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা এমন মৃত তোতা তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা। নোট, গাইড, কোচিংনির্ভর এই শিক্ষা সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়াচ্ছে বটে; কিন্তু মনুষ্যত্ব বাড়াচ্ছে না, চিন্তার উৎকর্ষ বাড়াচ্ছে না। এসব যদি কারো কাছে আপ্তবাক্য বলে মনে হয়, দর্শননির্ভর কথাবার্তা বলে মনে হয়, তবে তাদের জন্য কেজো উদাহরণও আছে। যাঁরা কেজো উদাহরণ পছন্দ করেন, অঙ্কের হিসাব নিশ্চয়ই তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কিভাবে দেশের ক্ষতি হচ্ছে সেই হিসাব নিন। যাদের জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, এমনকি স্নাতক, স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেটও আছে এবং যে সার্টিফিকেট এমনই ‘কার্যকর’, যা দেশের কোথাও কোনো কাজে লাগেনি। তারা বিদেশে চলে গেছে, অবর্ণনীয় কষ্ট করছে। অকহতব্য সেই শ্রম-ঘামের টাকায় রেমিট্যান্স এসেছে এক বিলিয়ন ডলারের মতো। অন্যদিকে দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন সেক্টরে যেসব কনসালট্যান্ট আনতে হয়েছে, বাংলাদেশকে তাঁদের বেতন-ভাতা বাবদ দিতে হয়েছে ছয় বিলিয়ন ডলার। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কী নেই, কোথায় কিসের এত ঘাটতি যে বিদেশ থেকে কনসালট্যান্ট এনে আমাদের ছয় বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হচ্ছে?

এই শিক্ষার্থীরা যা কিছু পড়ে, তা পাসের জন্য পড়ে। এরপর পড়ে চাকরির জন্য। ৫ ডিসেম্বরের একটি জাতীয় দৈনিক বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে প্রবেশের লাইনে দাঁড়ানো পাঠকদের সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখিয়েছে সেখানে কেউ সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ কিংবা গল্পের বই পড়তে আসেন না, আসেন বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য, পড়াশোনার জন্য। লাইব্রেরির দ্বিতীয় তলার সাধারণ পাঠকক্ষে সাহিত্যের বইগুলো ধুলা বুকে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে এবং কাতর চোখে দেখছে ক্যারিয়ারকেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চা। ধুলা জমারই কথা, কারণ সাহিত্যের বই কেউ হাতে নেন না। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বইগুলোতে ধুলা জমেনি, সেগুলো চকচকে। চকচকে হওয়ারই কথা, প্রতিদিন চাকরিপ্রত্যাশী তরুণরা চাকরির প্রয়োজনে এসব কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বই মুখস্থ করেন কি না। এই বিদ্যাকে চুরির বিদ্যা বলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ইংল্যান্ডে একদিন চুরির দণ্ড ছিল ফাঁসি, এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। চুরি করতে পারবে না বলে ফাঁসি। আজকে যে শিক্ষার্থী চুরি করতে পারে না, তারই হয় ফাঁসি। মুখস্থ বিদ্যা ঝেড়ে আসতে না পারলে না আছে গোল্ডেন এ প্লাস, না আছে বিসিএসে উত্তরণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, না বুঝে বই মুখস্থ করে পাস করা কি চুরি করে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরে মুড়ে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে চুরি করে নিয়ে গেলে তা চুরি নয়? আস্ত বই থেকে ভাঙা উত্তর বসিয়ে যারা পাস করে তারা চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়। আর যে হতভাগা সেই মুখস্থ বিদ্যায় সফল হতে পারল না, সে ফেল। শিক্ষা প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও এজাতীয় চুরি বিদ্যা শিক্ষার মূল্য নাই। সেখানে হাতে-কলমে শিখিয়ে কাজ দেখিয়ে দিতে হয়। একসময় এই ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই হিউয়েনসাংয়ের মতো পরিব্রাজক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন এবং গুরু শীলভদ্রের শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন। রাজা শীলভদ্র বাংলা অঞ্চলের কোনো এক রাজ্যের রাজা, যিনি ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য সব ক্ষমতা ও রাজ্যপাট ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করে হিউয়েনসাং বাংলা অঞ্চলে এসে থিতু হয়েছিলেন গুরু শীলভদ্রকে দেখে। দেখেছিলেন তাঁর জ্ঞানের অতল গভীরতা। কোনো দৈববলে টাইম মেশিনে চড়ে হিউয়েনসাং যদি আবার বাংলা মুলুকের শিক্ষক শ্রেণির সঙ্গে পরিচিত হতে আসতেন, তাহলে কেমন হতো তাঁর প্রতিক্রিয়া? শীলভদ্রের মতো শিক্ষক খুঁজতে গিয়ে যা দেখতে পেতেন, তা গ্রিক ট্র্যাজেডিকেও হার মানাত। দেখতেন, রাজ্যপাট ত্যাগ নয়, বরং কী করে শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে রাজ্যপাট তৈরি করা যায় তার জন্য শিক্ষকরা কিভাবে কোচিং ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন।

মানব ইতিহাসে যে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে জ্ঞান বিতরণের নিয়ম চালু হয়েছিল, সেই ভারতবর্ষ যা আজকের বাংলাদেশ, সেখানে কিভাবে শিক্ষকরা জবরদস্তি খাটিয়ে কোচিংয়ের নামে ছাত্রদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন এবং তাঁদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে কিভাবে ক্লাস টিউশনে ফেল করিয়ে দিচ্ছেন। কিভাবে তাঁদের লেখা রদ্দিমার্কা গাইড বই পড়তে বাধ্য করছেন। ডাক্তাররা যেমন কমিশন খেয়ে মানহীন ওষুধ কম্পানির ওষুধের নাম প্রেসক্রিপশনে লিখে দেন, এও তেমন বা তার চেয়েও খারাপ। যে গাইড বই পড়লে শিক্ষার্থীরা ভুল শিখবে, তেমন শিখতে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে, হুবহু ওই বই থেকে উদ্ধৃতি না দিলে কম নম্বর দেওয়া হচ্ছে। যে মেধাবী শিক্ষার্থীকে কোনোক্রমেই ফেল করানো সম্ভব নয়, তাকে কায়দা করে কম নম্বর দিচ্ছেন এবং নিজেদের এসব দুর্নীতি জায়েজ করার জন্য গভর্নিং বডির কাউকে কাউকে পকেটে পুরে ফেলছেন। ‘কোচিংবাজ শিক্ষকরা দুদকের জালে’ শিরোনামে ৫ ডিসেম্বর কালের কণ্ঠ যে প্রতিবেদন ছেপেছে, সেখানে একজন শিক্ষক বলেছেন, ‘ভালো শিক্ষকের কাছেই তো সবাই প্রাইভেট পড়তে চায়। আমার কাছে সবাই পড়তে চায় বলেই আমি পড়াই।’ হায় হিউয়েনসাং! হায় সাধক শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী পণ্ডিত শীলভদ্র! এবং শীলভদ্রের মতো আরো শিক্ষক যাঁরা সাধকরূপী শিক্ষক, যাঁরা শিক্ষাদানের জন্য রাজ্যপাট ছেড়েছিলেন এবং শিক্ষাদান খুশিদান, আনন্দদান বিনিময়ে অর্থগ্রহণ পাপ বিবেচনায় সাধু-সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেছেন এবং শিক্ষাকে জড় পদার্থের মতো নয়, বিশ্লেষণের দ্বারা, উপলব্ধির দ্বারা, প্রেমিকের প্রীতি নিয়ে আহরণের কথা বলেছেন, এই বঙ্গমুলুকে আজকের শিক্ষকদের দেখে তাঁদের কী অনুভূতি হয় জানতে ইচ্ছা করে। যে দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ের পাঁচ হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নেই; গবেষণাবিমুখতা যে দেশের শিক্ষকদের সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়েছে; জ্ঞানচর্চা নয়, মুনাফাচর্চাই যেখানে শিক্ষকদের বড় একটি অংশের অধিকতর মনোযোগের বিষয়; শিক্ষা সেখানে নোট বই ও কোচিং শাসিত শখের জিনিসই হবে, প্রাণের জিনিস হবে না। শিক্ষা সম্পর্কে শেষমেশ রবীন্দ্রনাথের কথাই মেনে নিতে হচ্ছে, ছিলাম খাঁচায় এখন বসিয়াছি দাঁড়ে। পায়ের শিকল আর কাটিল না।

লেখক : কথাসাহিত্যিক